পারানির কড়ি

সীমান্ত গুহ ঠাকুরতা

।। এক ।।

নিঁখুত একটা বলের মত লাল টুকটুকে সূর্যটা এসে থেমে রয়েছে মোবাইলের টাওয়ারটার মাথায়। নদীর দারে এই টাওয়ারটা বসেছে মাত্র মাস তিনেক হল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতেই পকেট থেকে আনমনে মোবাইলটা বার করল সুবোধ। মোবাইল পকেটে রাখার এই এক জ্বালা। ফোন আসুক বা না -আসুক, মাঝে মাঝে পকেট থেকে বার করে নাড়াচাড়া করতে হয়। না করে পারা যায় না। কিছু কিছু সম্পর্ক যেমন শুধুমাত্র অভ্যাসের ওপর টিকে থাকে, তেমনই অনেকটা।

সুবোধেরও তাই। ফোন-টোন বিশেষ আসে না সুবোধের। নেহাৎ হুজুগে পড়ে আর দশটা মানুষজনের দেখাতেই মোবাইলটা নেওয়া। বন্ধু-বান্ধবও তেমন নেই তার, আরও যাও দু-চারজন আছে তা এই গ্রামের মধ্যেই। ফোনটা আর তাকে করবেটা কে?

নগদ চার হাজার তিনশো টাকা দিয়ে গেল মাসেই এই মোবাইলটা কিনে দিয়েছে সুবোধের বাপ। নিরাপদ চক্কোত্তি এমনি এমনি টাকা খরচ করার মানুষ না। সস্তার একখানা পছন্দ করেছিল, সুবোধই ঝুলোঝুলি করে এইটে কেনায়। রঙিন মোবাইল সেট। এফ.এম. আছে, কামেরা আছে, আছে ইচ্ছেমত গান শোনার ব্যবস্থাও।

'বাউণ্ডুলেপনা বন্ধ করে এবার এট্টু ব্যবসাপাতির দিকে নজর দে। বন্ধু-বান্ধবের লাগে গপ্পো মারার জন্যি কেউ মোবাইল কেনে না। আমি আর কয়দিন...এবার কারখানায় না বসিল বাড়ি-সুদ্ধ না খেইয়ে মরবে বলো।' দাম মিটিয়ে দোকান থেকে বেরুতে বেরুতে বলেছিল নিরাপদ।

আজই প্রথম তাই দুপুর-দুপুর কারখানা খুলে বসেছিল সুবোধ। ওই বসাটুকুই অবশ্য সার। তিনমাস পরে আজই প্রথম শাটার তোলা হল। ধুলো - ঝাড়া, ঝুল-পরিষ্কার—এসব কাজই হল তিন ঘন্টা ধরে। সুবোধকে কিছুই করতে হয়নি। তিনটে ঠিকে লোককে সব বুঝিয়ে দিয়ে আর সুবোধকে দারোয়ান বানিয়ে বসিয়ে দিয়ে গিয়ে ভাত ঘুম লাগিয়েছে নিরাপদ। ঝাড় - পোঁছ শেষ হলে শাটার নামানোর দায়িত্ব দিয়ে গেছে সুবোধের কাঁধে।

'আর সন্ধের পর যাবি সাহাপুর বাজারে। ইলেকটিরি মিস্তিরে খপর দিয়ে আসবি একটা। কাল যেন অবিশ্য করে এই যে লাইন-টাইন সব চেক করি দ্যে যায়। ইঁদুর -বাদুড়ে কয়খান তার কেটে রেইখ্যে গেসে কে জানে।' যাবার আগে হুকুম দিয়ে গেছে নিরাপদ চক্কোত্তি, 'হিঙ্গলগঞ্জ মা তারা আইসক্রিম ফ্যাক্টারি'র প্রোপাইটার।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোবাইলটা আবার পকেটে ভরে রাখে সুবোধ। আনমনে চেয়ে থাকে অস্তগামী লাল সূর্যটার দিকে। এই যে ইস্কুল - কলেজের পাট চুকিয়ে, বন্ধু - বান্ধবের দলবল ছেড়ে কাজেকম্মে জুতে যাওয়া—এটাই কি জীবনের শেষ, নাকি শুরু? —কে জানে?

বাজারের দিক থেকে মোটরবাইক ভটভটিয়ে বিষ্ণু এসে দাঁড়ায়।

'কিরে, আইজ প্রথম খুললি দোকান?'

'অয়। সোমবার পূজা দিয় মেসিন চালু আইব। আইজ এই ঝাড়পোঁছ অইল।'

'তা ভালো করেছিস। এবার তো চোতমাসেই ভালো গরম পড়ি গেল।' বলতে বলতে বিষ্ণু মোটর বাইক স্ট্যান্ড করে, কারখানার ভিতরভাগে উঁকি মারে, বলে 'কাকা কই?'

'ঘরে। ঘুমায় বোধহয়।'

ভরসা পেয়ে বিষ্ণু ফস করে পকেটের থেকে সিগারেট প্যাকেট বার করে। একটা সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়ে সুবোধকেও দেয় একটা।' বলে, 'তা সন্ধ্যার পর চল মেলায় ঘুইরে আসি।'

সুবোধ সিগারেটটা হাতে নিয়ে নাড়েচাড়ে, এখানে বসে ধরাতে সাহস পায় না। হঠাৎ বেরিয়ে দেখতে গেলে নিরাপদ চক্কোত্তি পিঠের হাড়গোড় ভেঙে দেবে।

'আমবেড়িয়ার মেলায়?'

'অয়। পালা অইব রাত নয়টা থেকে। ভালো পালা, যোগেশগঞ্জের দল।'

'যাব খন। তুই এখন যাবি কোনদিকে?' সিগারেটটা বুক - পকেটে রাখতে রাখতে সুবোধ বলে।

'যাব সাহাপুর বাজারে। যাবি? চ ঘুইরে আসি।'

'যাব। দশমিনিট দাঁড়া। শাটারটা নামায়ে দিয়ে যাই।'

দশঘাটের দালালি করে বিষ্ণু বেশ দু-পয়সা কামাচ্ছে আজকাল। জমি কেনাবেচা থেকে যাত্রাপার্টির বুকিং— কিছুই ছাড়ে না বিষ্ণু। এলাকার যে কোনো মেলা আর ফাংশানে বিষ্ণু আছে। আর এসব করতে গেলে আর যা যা করতে হয়, সেসবও খুব মন দিয়ে করে বিষ্ণু। প্রতি সন্ধ্যায় বাঁকড়া - মোড়ের পার্টি অফিসে বসে থাকাটা ওর বাঁধা ডিউটি। বিরোধী পার্টি হাওয়া ঘুরছে এখন, বিষ্ণু জানে। লুটেপুটে খাবার এই তো সময়।

'যাত্রাপার্টি কি তুই আনলি?' বাইকের হাওয়ায় এলোমেলো হতে থাকে চুল সামলাতে সামলাতে সুবোধ জানতে চায়।

'অয়। আর আছেটা কে শুনি?' বিষ্ণু গা - ছাড়া ভাবে বাইক চালায়। এই অপেরাপার্টির মালিক আমার চেনা মানুষ। বিধুভূষণ মল্লিক। যোগেশগঞ্জে আমার মামার বাড়ির পাড়ায় থাকে। গুণী লোক। নিজেই পালা লেখে, ডিরেকশন দেয়। মিষ্টির দোকান অ্যাকখান, তারই পিছনে ঘর বানাইয়ে রিহের্সালের জন্যি। যাসখন একদিন আমার সঙ্গে রিহের্সাল দেখতি। যা একখান নায়িকা জুটাইয়ে না কাকায়, এক্কেরে ফাডাফাডি।

সুবোধ হাসে, 'এবারে বিয়েটা করি ফ্যাল বিষ্ণু। পয়সাকড়ি ভালোই হচ্ছে।'

'অয়। কইরে ফেলব এবার। মেয়ে দেখতিসে মায়ে।' সাহাপুর বাজারের মোড়ে ডানদিকের গলিতে বাইক ঢোকাতে ঢোকাতে বিষ্ণু বলে।

।।দুই।।

মেলা তো নামেই। আসলে ওই চার - পাঁচটা বাদাম তেলেভাজার দোকান আর একটা ছোটো যাত্রামঞ্চ। আজ শুক্লা দ্বাদশী, বারুণী - পূজা। মাঠের এককোনায় ত্রিপল খাটিয়ে গঙ্গাপুজো হয়েছে, মেলাটা সেই উপলক্ষ্যেই। শেষ চৈত্রের বেলা এখন। ধানকাটার কাজকম্ম মিটে গেছে সেই মাঘের শেষেই। লোকজনের হাতে এখন মেলা সময়। দিনমানে ঠা ঠা পড়া রোদ ছাড়লেও রাতের দিকটায় একটা হিমভাব ছাড়ে বাতাসে, এখনও। খোলা মাঠে বসে যাত্রা দেখতে মন্দ লাগে না এই সময়টায়।

বাঁধের ওপর পেল্লাই একখানা জেনারেটর বসানো হয়েছে। ভটভট আওয়াজে কান পাতা দায়। কালো ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বিষ্ণু বলে, 'পালা শুরু হয়ি গেছে দেরি হয়ি গেলো শালা।'

বাঁধের ঢাল বেয়ে হড়হড় করে নেমে যায় দুজনে। মাঠভর্তি শুধু কালো কালো মাথা। সব হাঁ করে গিলছে পালা। পিছনবাগে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে দাঁড়িয়ে যায় বিষ্ণু। বলে, 'তুই বস খানিক। আমি রঞ্জনের সঙ্গে এট্টু দেখা করি আসি।'

রঞ্জন মানে এই মেলার কমিটির সেক্রেটারি। বিষ্ণুকে ভালোই চেনে সুবোধ। যাত্রা দেখা না ছাই। মাতব্বর হচ্চে এখন, সবসময় ধান্দাবাজি।

মাটির ওপর চটিজোড়া পেতে বসে পড়ে সুবোধ। বেশিক্ষণ হয়নি শুরু হয়েছে পালাটা, কিন্তু এরই মধ্যে জমে গেছে। ছোট্ট একটু— বোধহয় কুড়ি হাত লম্বা - চওড়া স্টেজটার ওপর তিনটে মানুষ এখন দাপাদাপি করছে— নবাব, 'রক্তে রাঙা মসনদ', বিষ্ণু বলছিল আসার পথে।

ওই টুকুনি স্টেজের ওপর নানা রঙের চড়া আলোর ঝলকানি আর বাজনার শব্দের সঙ্গে চোখ - কান সইয়ে নিতে সময় লাগে। আস্তে আস্তে পালার বিষয়টা ধরতে পারে সুবোধ। দূর দেশে রাজ্যজয় করতে গিয়ে মারা গেছে রাজপুত্র । বেগম আর রাজকন্যা মিলে তাই কেঁদে ভাসাচ্ছে। গানে - গানে কান্নাটি চলছে।

ধূস ! এইসব একঘেয়ে পালাগুলো আর ভাল্লাগে না সুবোধের। শেষবেলায় নির্ঘাৎ দেখা যাবে রাজপুত্র মরেনি। তাকে উদ্ধার করে আনবে অন্য দেশের রাজপুত্র, যার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হবে। রূপকথার গপ্পো একেবারে। আর সেনাপতিটা নির্ঘাৎ শয়তান।

তবে রাজকন্যার রোলে মেয়েটা দারুণ পার্ট করছে। এই বুঝি সেই ফাটাফাটি নায়িকা! সত্যি মেয়েটাকে দেখতেও মিষ্টি। চোখদুটোও কেমন মায়ায় ভরা। গাঁ-গঞ্জের অপেরা পার্টিগুলোয় তা সুন্দরমুখ আজকাল চোখেই পড়ে না। যতসব আইবুড়ো কেলেকুষ্টি মেয়েগুলো মুখে একগাদা স্নো -পাউডার মেখে হেঁড়ে গলায় চেঁচায় খালি।

সুবোধ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। বেশ ঢলঢলে মুখখানা মেয়েটার। চোখদুটোয় কেমন একটা বিষণ্ণভাব। স্টেজের ওপর জ্বলতে নিভতে থাকা লাল - নীল আলোগুলো ক্রমাগত খেলে যাচ্ছে ওই মুখের ওপর, তবু মেয়েটার চোখদুটোর ওই বিষণ্ণভাব কেমন একই রকম ঠেকে সুবোধের চোখে। কী যেন একটা গভীর গোপন দুঃখ আছে চোখদুটোয়। কেমন একটা মায়া জাগায় মনে।

রাত বাড়ে। নদীর ওপার থেকে শীতল হাওয়া এসে বিভোর হয়ে বসে থাকে মানুষগুলোর গায়ে মাথায় কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে যায়। নবাব সেকেন্দার শাহের দুঃখে সাহজাদা মীরণের বীরত্বে, শাহজাদী মীরণের বীরত্বে, শাহজাদী ডেবউন্নিসার হাসি- কান্নায় তবু লোকগুলো কেমন বুঁদ হয়ে বসে থাকে। সেনাপতির হাঃ হাঃ হাঃ হাসির শব্দে খোকা ভয় পেয়ে মায়ের আরেকটু কোল ঘেঁষে বসে। ভাইয়ের শোকে আকুল শাহজাদীর 'কোথা গেল ভাই মোর' গান শুনে ধুতির খোটায় চোখের জল মোছে বুড়ো চাষি, বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির নিষ্ঠুরতায় শিউরে ওঠে সদ্য বিয়ে হওয়া ছোট্ট বউটা, শক্ত করে চেপে ধরে পাশে বসা স্বামীর হাতটা।

'কিরে, এক্কেরে জমে গিছিস দেখি। দু-পাত্তর টানবি নাকি? চল।'

কখন বিষ্ণু এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে, টেরই পায়নি সুবোধ। ঘোরের ভিতর থেকে যেন আচমকা জেগে ওঠে সে। বলে 'নাহ্, তুই যা মাঝরাতে নেশা করি বাড়ি গেলে ভোরবেলা বাপ আমাকে বাঁশ দেও পিটাবে।'

'তুই শালা বাপের ভয়েই মরলি' বলতে বলতে বিষ্ণু রওনা দেয়। মেলার থেকে একটু দূরে মাঠের ওপরই জমিয়ে বসেছে ওরা এখন, চার- পাঁচজন। সুবোধেরও পোষায় না। দুচারবার চেখে দেখেছে, গলা দিয়ে যে আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে নামে। হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে আবার যে ডুব দেয় পালার ভিতরে, সাহজাদীর ওই সন্ধ্যেবেলার নদীর মত চোখদুটো ভিতরে।

।।তিন।।

পালা ফুরতে ফুরতে রাত দেড়টা বাজল। নেসা - টেশা করে কখন যেন বিষ্ণু এসে আবার সুবোধের পাশে বসে পড়েছিল। স্টেজের আলো নিভতেই টপ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চ মালিকের সঙ্গে দেখা করি যাই। বিধুকাকা লোক খুব ভালো, আমারে খুব খাতির করে।'

স্টেজের পিছনবাদে ত্রিপল ঘেরা একটা চৌখুপরি ভিতর মেক-আপ আর মালপত্র রাখার ঘর। দরজা একটা রঙচটা পর্দা ঝুলছে, তার ওপর একটা চৌকো কাগজ সাঁটা, আঁকাবাঁকা হরফে আলতা দিয়ে লেখা 'সাজঘর'।

বিষ্ণু বেশ টাটের মাথায় পর্দা সরিয়ে ঢুকে গেল ভিতরে।

'কি কাকা, কেমন বুঝছ? পালা তো তোমার আজও হিট।'

চৌকির ওপর বসা মাঝবয়সী লোকটা বিষ্ণুর কথা শুনে হাসে, 'মানুষের আশীব্বাদ আর আর্টিস্টদের সাধনা...।' সুবোধ চিনতে পারে লোকটাকে। রোল করছিল পালায়। এখন সাজপোশাক খুলে লুঙ্গি আর ফতুয়ার মত একটা জামা পরে বসে আছে।

চৌকির পাশে রাখা টুলটায় বসতে বসতে সুবোধ বলে, 'তা তোমার নতুন পালা নামছে কবে?'

'যে আর বলতি হবে না কাকা। বুঝলি সুবোধ' সুবোধের দিকে ঘুরে বলে বিষ্ণু, 'নতুন একখানা পালা যা লিখেছে না কাকা, এক্কেরে

আগুন জ্বালায়ে দিবে। এবার আর ঐতিহাসিক না, রাজনৈতিক। সি পি এম পার্টির একেবারে কাপড় খুইলে দিবে। নামটা কি যেন দিসেন কাকা?'

'মানুষের অধিকার' বলতে বলতেই লোকটা চৌকি ছেড়ে উঠে আসে। পর্দা সরিয়ে মুখটা বাইরে নিয়ে হাঁক পাড়ে 'কইরে সন্তু, চাইরখানা চা দিয়ে যা মঞ্জরি, চা খাবি তো?'

সাজঘরের এককোনে চটের আড়াল থেকে মুখে তুলো ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে আসে মঞ্জরি, সুবোধ ভিতরে ভিতরে কেমন চমকে যায়। নামটা তো মঞ্জরি না, 'মিস সোনালি', না ওইরকম কী একটা শুনেছিল,

'কি গো মঞ্জরিদেবী, আছো কেমন?' বিষ্ণুর গলায় অন্তরঙ্গতার সুর।

'আছি একরম বিষ্ণুদা।' চা-দিতে আসে ছেলেটার হাত থেকে মাটির খুরিটা সাবধানে নিতে নিতে বলে মেয়েটা।

'এই আমার বন্ধু, সুবোধ। হিঙ্গলগঞ্জ বাজারের পাশে আইসকিরিম ফ্যাক্টারিটা দেখিছ? সেইটে ওদের।'

মেয়েটা সুবোধের দিকে তাকিয়ে হাসে, বলে 'কেমন লাগল পালা?'

সুবোধ অবাক হয়ে দ্যাখে, মেয়েটা তাদের মত এখানকার ভাষায় কথা বলে না বলে একদম শুদ্ধ, কলকাতার বাংলা। কেমন একটা লজ্জা হতে থাকে সুবোধের ভিতরে ভিতরে। যেমন অনেক কষ্টে সামান্য হেসে বলে 'খুব ভালো। খুব ভাল অ্যাক্টিং করেন আপনি।'

'শুধু অ্যাক্টিং না' ওপাশ থেকে বিধুকাকা বলে, 'মঞ্জরি মা'র আমার অনেক গুণ। গানটা কেমন গায় বলো! তার ওপর নতুন পালার ড্রেসের দায়িত্ব সব নিজের হাতে নিয়েছে। নিজেই যাবে কাপড় কিনতে কলকাতায়, পরশু।'

'আমি কিন্তু একা যেতে পারব না কাকা, অত কাপড় জামা একা বয়ে আনতে পারি আমি একা?' সামান্য আদুরে গলায় বলে মঞ্জরি।

'পারবি পারবি। কি আর এমন ওজন অইবো? কোলকাতা তো তোর চেনাজানা জায়গা। না হয় দেখি সুবীররে বলে। ভোরের ফাস্ট বাসটা ধইরে নিস, নয়তো সেই যোগশগঞ্জ ফিরতি রাত হইয়ে যাবে।'

নিকষ অন্ধকার বাঁধের ওপর টর্চ ফেলে আগে আগে হাঁটে বিষ্ণু। বলে, 'চল তাইলে একদিন যোগেশগঞ্জ, নতুন পালার রিহার্স্যাল দেইখে আসি। হেব্বি নাটক হচ্ছে রে। সিঙুর নন্দীগ্রাম নিয়ে। ভোটের আগে একটা শো করাইয়ে দেব আমবেড়িযার মাঠে, জইমে যাবে।'

বিষ্ণুর সব কথা ভালো কানে যায় না সুবোধের, আনমনে হুঁ-হাঁ দেয় মাত্র। চারপাশের এই জমাট অন্ধকারটাকে কেমন নিজের বুকের ভিতর ঢুকে যেতে দেখে সুবোধ। দ্বাদশীর চাঁদটা গেল কোথায়— সুবোধ ভাবে—আকাশে বুঝি মেঘ জমছে। কী একটা যেন হবে, কেমন গুমোট হয়ে আসে মনের ভিতরটায়। পরশু তো তাকেও যেতে হবে কলকাতায়— ফ্যাক্টরির মাল আনতে। ওই বড়বাজারে, আরপ ওই ফার্স্ট বাস ধরেই।

'আমি তো ষোল বছর পর্যন্ত কলকাতায় থাকতাম। সোনারপুরে, জ্যাঠার বাড়িতে।' সুবোধের হাতে ধরা ঠোঙা থেকে একটা বাদাম নিয়ে দু'আঙুলের নরম চাপে ভাঙতে ভাঙতে মঞ্জরি বলে, 'মাধ্যমিক পরীক্ষার পর সেই যে ছুটিতে বাড়ি এলাম, আর যাওয়া হল না।'

'কেন?'

'মা হঠাৎ মারা গেল। সংসারের হাল ধরতে হল। পড়াশুনা আর হল না। কত ইচ্ছে ছিল কলেজে পড়ব...। এখন তো ওই পাড়ার একটা অঙ্গনওয়াড়ি স্কুলে পড়াই।

বাসের পিছন দিকে বসেছিল মঞ্জরি, একাই। সুবোধ উঠেই দেখেছিল। মুড়োর দিকে মাথা গুঁজে দাঁড়িয়ে, কন্টাকটর ঠেলে গুতিয়ে পিছনদিকে পাঠাল, 'হাসনাবাদ নামবা তো দরজার কাছে কি করতেছ? পিছন যাও।' আর পিছনে যেতেই চোখে - চোখ পড়ে গেল। 'কোথায় চললেন?' মঞ্জরিই প্রথমে হেসে জিজ্ঞেস করেছিল। গ্রামের মেয়েগুলোর মত অত লজ্জার আড় নেই মেয়েটার। সহজ - সরল, কিন্তু তবু কোথায় যেন আলাদা- রকমের।

দীর্ঘ যাত্রাপথে সুবোধকে পেয়ে সত্যিকারের খুশি হয়েছিল মঞ্জরি।

'বিধুকাকা পয়সা দেয় না আপনাকে?'

'দেয়, তা সে না দেবার মতই। ওর দোষ নেই। ছোট দল। ন'মাসে ছ'মাসে একটা দুটো বায়না হয়। দল চালাবার খরচও তো বিশাল। শখের যাত্রা করে কে আর কত বড়োলোক হয় বলুন!' মঞ্জরি হাতের মুঠোয় জড়ো করা বাদামের খোসা জানলা দিয়ে উড়িয়ে দেয়। তারপর হঠাৎ বলে, 'আচ্ছা, আমায় 'আপনি' বলেছেন কেন? আমি তো আপনার থেকে অনেক ছোটো।'

'বয়সটাই কি সব নাকি?' সুবোধ হাসে 'কত বড়মাপের মানুষ আপনেরা। কত গুণ...। চাকরি করছেন, সংসার করছেন, গান গাইছেন, পালায় অ্যাক্টিং করছেন। আমরা সব ছোটখাটো মানুষ এক ব্যবসা সামলাতেই জীবন কেটি গেল।'

'ধ্যাৎ, কী যে বলেন না' মঞ্জরি লজ্জা পায়, তারপর হঠাৎ বলে, 'জানেন, আমার খুব শখ কলকাতার বড়ো যাত্রাপার্টিতে কাজ করি। কত ভালো পালা নামে চিৎপুর থেকে, কত বড়ো বড়ো আর্টিস্ট সব।'

'তা চলেন না চিৎপুরে একবার, কয়েকটা অপেরাপার্টির সঙ্গে কথা বলি দ্যাখেন। বড়বাজার থেকে চিৎপুর বেশি দূর না।'

'যাবেন?' মঞ্জরি হঠাৎ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, 'কথা বলেই দেখি, কি বলুন, ছোটোখাটো একটা রোলও যদি পেয়ে যাই।' তারপরই হঠাৎ কেমন নিভে গিয়ে বলে, 'না থাক। সামনের বছর বোনটার মাধ্যমিক, বাবারও শরীরটা ভালো না—।'

চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে হু হু হাওয়া ঢুকে মঞ্জরির চুল এলোমেলো করে দেয়। সেদিকে চেয়ে চেয়ে গলার কাছে কান্নার মত কী একটা বেদনা পকা দিয়ে ওঠে সুবোধের। সব সুন্দরকে ছুঁতে নেই, ছোঁওয়া যায় না— সুবোধ যেন মনের ভেতর আবছা আবছা বুঝতে পারে সেকথা।

সকালের কলকাতামুখো ট্রেন। চাঁপাপুকুর ছাড়াতেই মানুষের ভিড়ে বোঝাই হয়ে যায়। ভিড়ের চেহারা আর ঠেলাঠেলি দেখে মঞ্জরি কেমন একটু যেন ভয়ই পেয়ে যায়। হা-ব্যাগ থেকে একটুকরো কাগজ বা করে বলে, 'আপনাপ মোবাইল নম্বরটা লিখে দিন, যদি হারিয়ে যায়, কোনো বুথ থেকে আপনাকে ফোন করব।'

সুবোধ যত্ন করে লিখে দেয় নম্বরটা। ওপরে নিজের নামটাও লেখে দরদ দিয়ে। যাক হারিয়ে মঞ্জরি, তবু সেই অজুহাতে যদি একবারও বেজে ওঠে বুকপকেটের মোবাইলটি। নগদ চারহাজার তিনশো টাকা দিয়ে যন্তরটা কেনাই সার হয়েছে।

বড় বাজার পৌঁছাবার পর মালটুকু নিতে সুবোধের সাকুল্যে লাগে আধঘন্টা। নিরাপদ চক্কোত্তির বারো বছরের বাঁধা দোকান। প্রতি বছর গরমকাল জুড়ে হপ্তায় হপ্তায় মাল নেওয়া হয়। লিস্টিটা ফেলে দিলেই হল, ওরাই সব বেঁধেছেদে রেডি করে দেয়। মাল আর কি— কয়েক প্যাকেট ভ্যানিলা, কোকো, চকোলেট পাউডার; কয়েক প্যাকেট রং— এইসব। তাও এখন সিজন পড়েনি, মাল তাই সবই অল্প অল্প।

সময় বরং একটু বেশি লাগল মঞ্জরির। বড্ড খুঁতখুঁতে মেয়ে। দেখেশুনে ঘেঁটেঘুঁটে এক -একটা কাপড় কেনে আর খালি সুবোধের মত চায়। 'নেতার রোলে এই ধুতিটা কেমন হবে?' 'চাষিবউয়ের গায়ে এই শাড়ি মানাবে?' সুবোধ খালি হাসে। সে এসবের বোঝে কী!

ফিরতে পথে, তখন সন্ধে নেমে গেছে, ট্রেনের জানলায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল মেয়েটা। সুবোধ জেগে বসে রইল ঠায়। ব্যাঙ্কের ওপর গুচ্ছের মালপত্র, ঘুমোলে চলে? তবু জেগে থাকতে ভালই লাগছিল সুবোধের। বুকপকেট থেকে মোবাইলটা বার করে আপনমনে নাড়াচাড়া করছিল সে। তারপর খুব সন্তর্পণে, সকলের চোখ এড়িয়ে একটা ছবি তুলল সে উল্টোদিকে বসা ঘুমন্ত মঞ্জরির। যারা ঘুমিয়ে থাকে, এভাবেই বোধহয় তাদের অনেক কিছু চুরি হয়ে যায় খুব গোপনে, তারা টেরও পায় না।

।। পাঁচ।।

দুপুরের দিকে আকাশটা কালো করে যেন খামোকাই একচোট ঝড়-জল হয়ে গেল। তারপর সেই যে কারেন্ট গেল, তার ফেরার নাম নেই। বোধহয় তার - ফার ছিঁড়েছে কোথাও। প্রথমদিন পুজো - টুজো মেসিন পত্তর চালু হল, মাল বেরুল না একপিসও। তবু সারাদুপুর দোকান খোলা রাখতে হয়েছিল। ব্যবসায় প্রথম দিন বলে কথা। ব্যাপারীরা আসে, মাল বুকিং করে টুকটাক। সারা গরমকাল জুড়ে খাতা চালু করে দিয়ে যায়

পাঁচটা নাগাদ কারখানার সাটার নামিয়ে তালা দিচ্ছিল সুবোধ। বিষ্ণু এসে দাঁড়াল বাইক নিয়ে।

'বন্ধ করতিছিস?'

'অয়, কেন?'

'ঘেরের ধারের মাঠে আয়, কথা আছে।'

এটুকু বলেই বাইক ঘুরিয়ে রওনা দেয় বিষ্ণু। ওর গলার স্বরটা কেমন একটু অন্যরকম ঠেকে সুবোধের কানে। তালা মেরে চাবিটা বাইকে দিয়ে আসতে যায় ভিতরবাড়িতে।

নদীর ধার ঘেষে বিশাল বিশাল পাঁচ-ছটা ভেড়ি। স্থানীয় লোকজন বলে 'ঘের'। বাগদার চাষ হয়। এই এলাকার সবচেয়ে লাভের ব্যবসা। বিষ্ণুও নাকি এ বছর লিজ নিয়েছে একটা। চারদিকে জলের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে বি.এস.এফ. -এর গাড়ি যাতায়াতের সবু পিচ রাস্তা। তারই পাশে একটা কালভার্টের ওপর বলেছিল বিষ্ণু। একা না, ওরই বয়সী আরও চার - পাঁচটা ছেলে। ছেলেগুলোকে চেনে সুবোধ। এক্কেবাহে দাগী মাল সবকটা। যখন যে পার্টি ক্ষমতায়, তখন সে পার্টির মাতব্বরদের আশেপাশে ঘোরে। বিষ্ণুর পাশেই বসে বাপি। দিন-তিনেক আগেও গরু-পাচারের কেসে ধরা পড়েছিল। বি.এস.এফ. তুলে দিয়েছিল হিঙ্গলগঞ্জ থানার হাতে, পরে পার্টির লোক গিয়ে ছাড়িয়ে আনে।

'তুই নাকি কাল মঞ্জরিরে নিয়ে কলকাতায় গিসিলি?' সরাসরি প্রসঙ্গে আসে বিষ্ণু, কোনোরকম ভনিতা ছাড়াই।'

সুবোধ একটু হাসে, 'না। আমি নিয়া যাইনি। বাসে দেখা হইয়ে গেল, একসঙ্গে গেলাম। কেন?'

'কেন আবার কি? তুই জানিস না মঞ্জরিরে বিষ্ণুদা—' পাশ থকে রীতিমত ফুঁসে উঠেছিল বাপি, কিন্তু বিষ্ণু ওকে হাত তুলে ইশারায় থামায়, সুবোধের দিকে ফিরে বলে, 'সত্যি কইরে বল সুবোধ, মঞ্জরিরে তুই লাইন করতিছিস?'

সুবোদ আবারও হাসে, 'অত মুরোদ আমার নাই বিষ্ণু।'

বিষ্ণু কেমন একটু থমকে যায়, 'কেন, তোর আবার অভাবটা কীসের? তোর বাপের তো পয়সার ফেলাছড়া। আইজ বাদে কালে সবই তো তোর হইব।'

'পয়সায় কি সব হয় রে! মেয়েটারে মনে মনে ভালোবাসার যোগ্যতাও আমার নেই। ও অইল আর্টিস্ট, তোর - আমার মত মানুষও না। ভাগ্য করে থাকলে অনেক নাম করবে ওই মেয়ে। আমার তো জীবন কাটবে এই হিঙ্গলগঞ্জের কারখানায় বসেই— সিজন টাইমে বরফ বেচে আর অফ সিজনে ভ্যারেন্ডা ভেজে।'

খানিক চুপ করে থাকে সুবোধ। বিষ্ণুর পাশে বসা ছেলেগুলো উসখুস করে, এত লেকচার ওদের সহ্য হয় না। যত কতক আপনমনেই বসে সুবোধ, 'আমাদের ঘর চালাবার মত মেয়ে এই গাঁ-গঞ্জে অনেক আছে। কারোরে ভালো লাগল আর পয়সার জোরে ভুলায়ে ভালায়ে তারে বিয়া কইরে ঘরে নিয়া আসলাম— সব জায়গায় এমন বিচার চলে না রে! তুইও পারলি ওরে ছেইড়ে দে বিষ্ণু। ওরে ওর পথে চলতি দে, আইটকাস না।'

ফিরতি পথে, সরু পিচরাস্তা ধরে হাঁটতে হংটতে পকেট থেকে মোবাইলটি বার করে যেন কত আপনমনেই নাড়াচাড়া করে সুবোধ। মেমরি কার্ডের ভিতর সযত্নে রাখা একটা ছবি খুলে ধরে স্ক্রিনে। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে সেদিকে। দ্যাখে, কেমন একটা অন্যরকম আলো এসে পড়েছে ছবিতে, মুখটায়। কী ভেবে পিছনে তাকায় সুবোধ। পশ্চিম আকাশে। মোবাইলের টাওয়ারটার ঠিক মাথায় এসে ঝুলে আছে সূর্যটা। একেই বুঝি কনে দেখা আলো বলে!

মুছে দেবে নাকি ছবিটা চিরতরে—ভাবে সুবোধ। তারপর কী ভেবে আবার বুক পকেটে ভরে রাখে মোবাইলটা। থাক ছবিটা। সব কষ্টের নিরসন হয় না, সব কষ্টের নিরসন চায় না মানুষ। কিছু কিছু বেদনাকে বুকের মধ্যে রেখেই পথ চলতে হয় তাকে। ওইটুকুই তো মানুষের বেঁচে থাকার সুখ।